প্রীতি ও ভালোবাসার বন্ধন

যুথিকা বড়ুয়া

(এক)

রক্তের সম্পর্ক সবচে' বড় সম্পর্ক। আপনজন যত দূরেই থাকুক, সম্পর্ক চিরকাল অটুট থাকে! কখনো ছিন্ন হয়না! আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্নভাবে থাকার কারণে সম্পর্কের গভীরতা ক্রমশ কমে আসে। আগের মতো তেমন টান আর থাকে না। তদ্রুপ অনাত্মীয়া, অচেনা অপরিচিত মানুষের সাথে অগাধ মেলামেশায় এবং উদয়াস্ত মুখ দর্শণে সামাজিক ভ্রাতৃত্ববোধ এবং অজানা একটা আর্কষণ গড়ে ওঠা খুবই স্বাভাবিক। যার সূত্র ধরে অচীরেই আমাদের কোমল সবুজ হৃদয় জন্ম নেয়, ভক্তি-শ্রদ্ধা, স্নেহ-মায়া-মমতা, ভাব ভালোবাসা। যে ভালোবাসায় কোনো স্বার্থ নেই, কোনো চাহিদা নেই, নেই কোনো ঈর্ষা, ক্রোধ, পারস্পরিক অসামঞ্জস্যতা, মান-অভিমান, অনুযোগ ও অভিযোগ কিছুই নেই! যার সাথে রক্তের কোনো সম্পর্ক নেই!

যেমন আমাদের নবাগতা প্রতিবেশী সেলিনা, ওরফে পারুল, মাত্র দু'দিনের আলাপচারিতায় আমাদের দুজনার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। পারুল খুবই মিশুকে এবং মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে। কথায় কথায় ওর টোলপড়া গালে একরাশ মুক্তাঝরা অনিন্দ্য সুন্দর হাসি ফুটে উঠত। আর হাসিটা আমার একটা ছোঁয়াচে রোগ। কাউকে হাসতে দেখলে আমিও হাসতে শুরু করি। এটা এক ধরণের আনন্দও বলা যায়। সে যাই হোক, আবেগপ্রবণ, সরলমনা পারুল প্রথম দর্শণে এমন অন্তরঙ্গভাবে আমায় 'দিদি' বলে সম্বোধন করলো, ও' যেন আমার কত দিনের চেনা! কত আপন, ওর সাথে আমার বহুদিনের সম্পর্ক! যেদিন ভাই-বন্ধু, স্বদেশ-স্বজন, আত্মীয়-পরিজনের সান্নিধ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, সাত সমুদ্র তেরো নদী পার করে এসে প্রবাস জীবনে গহীন অনুভূতি দিয়ে প্রথম অনুভব করেছিলাম, যেন স্বদেশেই বসবাস করছি।

যাযাবরের মতো জীবন পারুলের। স্বামীর চাকুরির সুবাদে ওরা সপরিবারে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ায়। প্রবাস জীবনে শত ব্যস্ততা আর প্রতিকুলতার মধ্যেও আমরা অবসর যাপন করতাম টেলিফোনের মাধ্যমে। পারুল গল্প করতো মিডল-ইষ্টের। আমি উন্মত্ত চিত্তে শুনতাম, জানা দেশের অজানা কথা। এভাবেই আমাদের প্রাত্যহিক দিনগুলি বেশ আনন্দ-উচ্ছাসে কাটতে লাগল।

সেদিন ছিল ঈদ। বাচ্চা-বুড়ো-জোয়ান সকলেই প্রাণবন্ত উচ্ছাসে মেতে ওঠে ঈদের আনন্দ উৎসবে। অথচ সকাল থেকেই দিনটা কেমন নীরব, নিরুচ্ছাস, বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে আছে। মেঘলা আকাশ। সম্পূর্ণ কালো মেঘে ঢাকা। সূর্য্য দশর্ণের কোনো সম্ভবনাও ছিল না। কখন যে বেলা গড়িয়ে, অপরাহ্ন পেরিয়ে গেল, টের পাই নি। গোধূলীর পূর্বেই ঘনিয়ে এসেছে অন্ধকার। মনে হচ্ছিল, এক্ষুণি ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি নামবে। এতে মানব মনেও প্রচন্ড প্রভাব পড়ে, প্রতিক্রিয়া ঘটে। মানুষের জীবনকেও করে নিয়ন্ত্রিত। প্রকৃতির সাথে মানব মনের এ এমন এক নিবিড় সর্ম্পক, যার দৃষ্টান্তসরূপ আমি নিজেই সেই প্রকৃতিতে নিমজ্জিত হয়ে বিষন্ন মনে টি.ভি দেখছিলাম বসে বসে।

হঠাৎ টেলিফোনটা ঝন্‌ঝন্ করে বেজে উঠতেই আমার হৃদস্পন্দনটাও যেন সজীব হয়ে ওঠে। চলতে শুরু করে দ্রুত গতীতে। আমি একরাশ উৎসুক্য নিয়ে দৌড়ে রিসিভারটা তুলতেই বুকের ভিতরটা কেমন যেন ছ্যাঁৎ করে উঠল। এক অভিনব কোমল অনুভূতির জাগরণে আবেগে বশীভূত হয়ে আমি চকিতে স্বম্ভিত হয়ে গেলাম।

আহাল্লাদে গদ্গাদ্ হয়ে পারুলের 'দিদি' শব্দের উচ্চারণের সাথে সাথেই আবেগে আপ্লুত হয়ে মুহূর্তে কোমল হৃদয়টা আমার গহীন স্নেহ-মমতায় ভরে উঠল। ধীরে ধীরে মনঃশ্চোক্ষে উদ্ভাসিত হতে লাগল, পুতুলের মতো আমার ছোট্টবোন মিনুর শুভ্র গোলাপগালের তুলতুলে নরম দুষ্টুমিষ্টি সেই মুখমালা। আমি হারিয়ে গেলাম, কৈশোরের হাজার মায়া জড়ানো সোনাঝরা দিনের অম্লান স্মৃতির মণিমেলায়। যখন উন্মুক্ত নীলাকাশের নীচে মখ্মলে স্নিগ্ধ সবুজ ঘাসের প'রে কিংবা নাম না জানা সদ্য প্রস্ফূটিত লাল-নীল-হলদে-বেগুনী ফুলের বিকশিত পাঁপড়িগুলিতে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে এসে বসা রং-বেরংএর ফড়িং, প্রজাপতি দেখলেই মিনু উর্দ্ধঃশ্বাসে ছুটে যেতো ওদের হাতের মুঠোয় ধরতে। ততক্ষণে বুদ্ধির চাতুর্য্যে ওরা চোখের পলকে ফাঁকি দিয়ে ফুরুৎ করে উড়ে পালাতো। মিনুও নাগাল পাবার আশায় দু'হাত প্রসারিত করে মরিয়া হয়ে ধাওয়া করতো ওদের পিছু পিছু।

কিন্তু কতক্ষণ, পুস্পবাগিচার এমাথা ওমাথা বার ক'য়েক প্রদক্ষিণ করেই মিনু হাঁপিয়ে উঠত। তখন ও' বিরক্ত হয়ে হাতের আঙ্গুলগুলি কাঁমড়ে ধরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তো। আর চরম ব্যর্থতায় ঠোঁটদুটো ফুলিয়ে, পা-দু'টো বাঁকা করে, অশ্রুসিক্ত চোখে এমন এক অদ্ভুদ দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকতো, বুকটা মোচড় দিয়ে উঠলেও কিছুতেই হাসি চেপে রাখা যেতো না। ততক্ষণে তুলকালামকাণ্ড শুরু হয়ে যেতো মিনুর। চিৎকার চেঁচামিচি করে পাড়ার লোক জড়ো করতো। আর লোকের ভীড় জমে উঠলেই অপমানে, অভিমানে মিনু ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠত। তখন ওকে শান্ত করতে গিয়ে বুকের গভীরে জড়িয়ে ধরে, আদর করে ওর কপালে, গালে চুম্বনে চুম্বনে অবুঝ মনটা ওর মুহূর্তে একরাশ অনাবিল খুশীতে ভরিয়ে দিতাম। আর তক্ষুণি ওর আঁধার মলিন-ম্রিয়মান মুখমালায় হাসির ঝিলিক দিতে দিতে খিল্খিল শব্দে বয়ে যেতো মিনুর রাশি রাশি হাসির ঝর্ণা।

হঠাৎ ধমক দিয়ে ওঠে পারুল। বলে,-"কি গো দিদি, কোথায় গেলেন? চূলোয় তেল জ্বলছিল বুঝি!"

আমি চমকে উঠি। ফিরে আসি বাস্তবে।

(দুই)

অপ্রত্যাশিত পারুলকে পেয়ে দিন বেশ ভালোই কাটছিল। প্রত্যেক উৎসবে-অনুষ্ঠানে, পূজা-পার্বনে আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হতো। খুউব আনন্দ করতাম। পার্কে ঘুরতে যেতাম, পিকনিক করতাম। কখনো বা প্রকৃতির মন মাতানো রূপবৈচিত্র্যে নিমজ্জিত হয়ে এবং স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছাসের টানে সংসারের সকল বন্ধন তুচ্ছ করে, কক্ষচ্যুত উল্কার মতো বেরিয়ে পরতাম, বাইরের প্রাণোৎচ্ছল রঙ্গিন পৃথিবীতে। বিদেশী পর্যটকদের মতো আমরা দু'জনে প্রচন্ড বিস্ময় নিয়ে শহরের বিভিন্ন মনোহরণকারী দর্শণীয় স্থানগুলি একে একে প্রদক্ষিণ করতাম।

হঠাৎ একদিন শুনি, অবিনার্য কারণবশতঃই পারুল সপরিবারে দেশান্তর হচ্ছে। আমার তো শুনেই বিদ্যুতের শখ্ খাওয়ার মতো সারা শরীরে এমন একটা ঝটকা লাগল। মেঘের আড়ালে সূর্য ডুবে যাবার মতো উৎফুল্ল মনটা আমার তৎক্ষণাৎই বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে গেল। আমি বাক্যহত হয়ে পড়ি। হাঁ করে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকি। বলে কি পারুল! কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না। ভাবলাম, পারুল ঠাট্টা করছে। কথায় কথায় ঠাট্টা-রসিকতা করা, হাসি মজাক করা ওর চরিত্র্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ঠ। কিন্তু না, তার ক'দিন পরই দেখলাম, পারুলের যথাযথ প্রস্তুতি পর্ব শুরু হয়ে গিয়েছে।

অগত্যা, করণীয় কিছুই নেই। অচিরেই ঘনিয়ে আসে স্মৃতিপটে ধরে রাখার মতো একটি বিশেষ স্মরণীয় মুহূর্ত, অর্থাৎ বিদায়ের পালা। কিন্তু বিদায় মানেই তো বিচ্ছেদ! আর বিচ্ছেদ মানেই বেদনা! যা আমার কোমল

হৃদয়কে বড্ড বেশী কষ্ট দেয়। কিন্তু কেন? পারুল তো আমার কোনো আত্মীয় নয়! ওতো কেউ হয় না আমার! বছর তিনেক আগেও তো ওকে চিনতাম না, জাতাম না। তা'হলে?

হয়ত অদৃশ্য এক দৃঢ় বন্ধনে জড়িয়ে পড়েছিলাম বলেই! ওকে মনে-প্রাণে ভালোবেসে ফেলেছিলাম বলেই! আর তাই সেইদিন সারারাত দু'চোখের পাতাগুলিকে কিছুতেই এক করতে পারি নি। পারে নি নিদ্রাদেবীর বাহুমন্ডলে গভীর তন্ময় হয়ে পরিবেষ্টিত হতে। ভিতরে ভিতরে ক্ষণপূর্বের বেদনাময় গহীন অনুভূতিগুলি নদীর ঢেউ-এর মতো বার বার মস্তিস্কের স্নায়ূকোষে এসে লাগছিল আর দংশন করছিল। যখন আমার অন্তরের কষ্ট-বেদনাগুলি তরল হয়ে অঝোরে নয়নে বইছিল। আর তখনি মনে পড়ে গেল, ঠিক এমনি করেই অদৃশ্য মায়াজ্বালে জড়িয়ে, অশ্রুজলে হৃদয়ের দুকুল প্লাবিত করে চিরদিনের মতো বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছিল আমাদের বুলবুল।

বুলবুল ছোট্ট একটি পাখী। একদিন প্রবল ঝড়ের মুখে হঠাৎ কোথা থেকে উড়ে এসে আমাদের রান্নাঘরের চাল ঘেঁষা বিশাল পেঁপে গাছের ডালে চুপটি করে বসে থর্ থর্ করে কাঁপছিল। রক্তে ভেসে যাচ্ছিল ওর সারা গা। কিসে যেন কাঁমড়িয়ে ঘা করে দিয়েছিল। তাড়া করলেও যাচ্ছিল না!

অবশেষে মিনুর একান্ত পীড়াপীড়িতেই পাখীটিকে আশ্রয় দেওয়া হলো, দো-তলার ঘরের সিঁড়ির কোণায় এবং যথাযথ সেবা-শুশ্রূষায় সুস্থ-সবল হয়ে দু'দিনেই একটি ফুটফুটে ছোট্ট শিশুর মতো চাঙ্গা হয়ে উঠল। তখন কি আর ওকে ছেড়ে দিতে মন চায় কখনো! বুলবুল নামকরণেই রয়ে গেল আমাদের পোষা হয়ে। থাকতো খাঁচার ভিতরে। আর তার অব্যক্ত আনন্দে মিনু উতলা হয়ে নাওয়া খাওয়া ছেড়ে সারাদিন খাঁচা ধরে বসে থাকতো। বুলবুলকে কখনো একা থাকতে দিতো না। অথচ নিজে অবোধ শিশু, আর বুলবুল একটা অবলা ছোট্ট প্রাণী। মিনু সারাক্ষণ আবোল-তাবোল বকতো ওর সঙ্গে। বুলবুলের মা-বাবা কোথায়? হারিয়ে গ্যাছে কি না! ওর মন খারাপ হচ্ছে কি না! ওর ঠোঁটটা এতো লম্বা কেন? ওর দাঁত নেই কেন? খাবার চিবোয় কিভাবে? হাজারটা প্রশ্ন মিনুর। আর বুলবুলও যেন কত বুঝতো ওর কথা! ক্ষণে ক্ষণে পাখনা মেলে নেচে উঠতো আর কানে তালা লাগিয়ে কর্কশকণ্ঠে ওর ভাষায় গেয়ে উঠতো, "টিরিট্টি, টিরিট্টি!"

একদিন খাঁচাটা বারান্দার কার্ণিশে ঝুলিয়ে রাখতে গিয়ে মাটিতে পড়ে খাঁচার দরজাটা বেঁকে যায়। মোটা তার দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দেওয়া সত্ত্বেও দরজাটা কিছুতেই আর বন্ধ হতো না। আলগাই থাকতো সারাদিন। ভয় হতো, জন্তু-জানোয়ারের কি ভরসা! বুলবুল উড়ে না পালিয়ে যায়!

কিন্তু তার পরেও প্রায় নয়মাস প্রভুভক্তের মতো পোষা হয়ে ছিল। ভাবলাম, বুলবুলও বোধহয় আমাদের মতো মায়ার বন্ধনে জড়িয়ে পড়েছে। ওদের অন্তরেও মায়া-মমতা-ভালোবাসা আছে। কিন্তু ওযে একটা পশু, মানুষের আদর ভালোবাসার মর্ম কখনোই বুঝবে না! যার মূল্য কোনদিনই দিতে পারবে না! আর সেটাই দৃষ্টান্তসরূপ প্রমাণিত করে, একদিন দিগন্তের প্রান্তরে উষার প্রথম সূর্য্যের উজ্জ্বল আলো উদ্ভাসিত হবার পূর্বেই বুলবুল কখন যে খাঁচা থেকে বেরিয়ে উড়ে পালিয়ে গেল, আমরা টেরই পেলাম না কেউ! ভাবলাম, কি আনন্দময় হাস্যোজ্জ্বল নির্মল সকাল! বাইরের মুক্ত গগনে বিশুদ্ধ বাতাস কিছুক্ষণ উপভোগ করে নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। কিন্তু বুলবুল আর ফিরে আসে নি। হয়তো ভুলে গিয়েছিল ফিরে আসার রাস্তা। কিংবা বিগতদিনের প্রবল ঝড়ের বেগে হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া ওর সঙ্গী-সাথীদের পুণর্মিলনের আনন্দে নিশ্চয়ই ভুলে গিয়েছে, অনাকাঙ্ক্ষিত সদ্য ফেলে আসা বন্দী জীবনে ক্ষণিকের পাওয়া মাবনপ্রীতি এবং একটি অবোধ শিশুকন্যার আদর ও তার হৃদয় নিঃসৃত কোমল ভালোবাসা! কে জানে!

কিন্তু মিনুকে বোঝাবে কে! আমাদের কোনো কথাই শুনতো না। বেচারীর নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, মুখে হাসি নেই! প্রতিদিন মনমরা হয়ে ছাদে গিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা বুলবুলের পথ চেয়ে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকতো। আর গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ডাক দিতো,-"বুলবুল, বুলবুল! তুই কি পথ হারিয়ে ফেলেছিস? আমাদের বাড়ি চিনতে পারছিস না?"

কোনো পাখী একলা উড়ে যেতে দেখলেই হাতদু'টো নেড়ে বলতো,-"এই তো বুলবুল, আমি এইখানে! আয়, শীগগির নীচে নেমে আয়! সেই কখন থেকে তোর জন্য অপেক্ষা করে আছি! নেমে আয় শীগ্‌গির!"

কিন্তু কোথায় বুলবুল! আকাশের গায়ে ক্রমশ অন্ধকার ঢলে পড়লেই কাঁদতে কাঁদতে চোখমুখ ফুলিয়ে হয়রান হয়ে যেতো। মনবেদনায় এবং মিনুর দূরাবস্থায় তখন আমরাও মর্মাহত হতাম। কিন্তু কতদিন! দিন যায়, মাস যায়, কেটে যায় বছরের পর বছর!

ততদিনে শৈশবের ধূলোবালি ঝেড়ে ফেলে মিনু কৈশোরে, আমি যৌবনের চৌকাঠে পৌঁছেই হৃদয়পটভূমি থেকে ক্রমশ একটু একটু করে মুছে যেতে লাগল, বুলবুলের স্মৃতি। বিলুপ্ত হতে লাগল, হৃদয়ের গভীরে জমে থাকা বুলবুলের প্রতি একরাশ মায়া-মমতা আর ভালোবাসা।

হয়তো এমনি করেই একদিন পারুলও আমাদের ভুলে যাবে। ভুলে যাবে ঋতুর মতো পরিবর্তিত জীবন যাত্রার অন্তবিহীন পথ চলতে চলতে পিছনে ফেলে আসা ক্ষণিকের হৃদয় স্পর্শ করা মানবপ্রীতির আনন্দঘন মুহূর্তের কিছু স্মৃতি। ভুলে যাবে, বর্ষণমুখর একাকী নির্জন সন্ধ্যায় টেলিফোনে ওর উচ্ছাসিত আলাপন, হাসি-গুঞ্জরণ, প্রীতি ও ভালোবাসার অবিচ্ছেদ্য বন্ধন। যা প্রাত্যহিক জীবনে আমার স্মৃতির পথে অম্লান পাথেয় হয়ে থাকবে।

সমাপ্ত

যুথিকা বড়ুয়া : কানাডার টরোন্টো প্রবাসী গল্পকার ও সঙ্গীত শিল্পী।

jbarua1126@gmail.com